BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03090027

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 09| September 2025| e-ISSN: 2584-1890

শিক্ষার বিবর্তন

Asma Khatun

BA Honours, Burdwan University
Email: asmakhatun123000@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

প্রাচীন শিক্ষা ছিল ধর্মীয় ও শ্রেণীভিত্তিক। এছাড়া শিক্ষক কেন্দ্রিক শিক্ষা। যেখানে শিক্ষকই ছিল সর্বেসর্বা। শিখন পদ্ধতি ছিল ভার যুক্ত ও বক্তৃতার মাধ্যমে। শিক্ষার্থীর ভূমিকা ছিল গৌণ। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সেখান থেকে সরে এসে শিক্ষার্থীকে বসিয়েছে মূল কেন্দ্রে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর সহযাত্রী হবে শিক্ষক এবং প্রতিটি শিশু আনন্দের সাথে নিজস্ব গতি আগ্রহ ক্ষমতা অনুযায়ী শেখার সুযোগ পাবে এবং শিক্ষাকে কার্যকর করে তুলবে।

মূল শব্দ: *শিক্ষা, শিখন পদ্ধতি, শিক্ষার্থী, শিক্ষা ব্যবস্থা, গুরুকুল, উডের ডেসপ্যাচ, জাতীয় শিক্ষানীতি।*

সূচনা:

প্রাচীনকালে ছিল না কোনো স্কুল, কোনো শিক্ষক, পুস্তক। তখন মানুষ প্রকৃতি, অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শেখা শুরু করে। তাদের চারপাশের প্রকৃতি, বৃষ্টিপাত তুষারপাত, বনে লাগা আগুন, পশু পাখির আচরণ পর্যবেক্ষণ করে অনুকরণ করে মানুষ শিখেছে। মানুষ এইসব অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করে যখন বর্ণমালার প্রথম অক্ষরগুলি উদ্ভাবন করে গাছের ছালে, তাল পাতায়, তামার পাতে নিজের মনের ভাবনা চিন্তাকে রূপ দিতে পেরেছিল তখন থেকেই মানব সভ্যতার নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য-সমাজ ও সমাজের মানুষের কল্যাণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন। শিক্ষায় জাতির চালক চালিকাশক্তি। বিভিন্ন দেশের ও সংস্কৃতিতে পার্থক্য থাকলেও মানব শিশুর শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন, দৈহিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, কাজ করার ক্ষমতা অর্জন, অভিযোজনে সাহায্য করা, অর্থনৈতিক বিকাশ, একতা, নৈতিকতা সর্বোপরি প্রকৃত মানুষ হওয়ার কথাই বলা হয়। একটি পশু ও মানব শিশুর কোন তফাৎ থাকে না মানব শিশু পশুর মতোই সমাজ, শিক্ষা নৈতিক ভালো-মন্দের ধার ধারে না। কিন্তু সেই মানব শিশুকে কোমল চিত্ত বৃত্তি, মৈত্রী, সামাজিকতার প্রীতি স্নিগ্ধ স্পর্শ মার্জিত আচরণে মনের পশুত্বকে অবদমিত করে মনুষ্যত্বে উন্নীত করাই হলো শিক্ষার উদ্দেশ্য।

প্রাচীনকালে শিক্ষা ব্যবস্থা:

প্রাচীন কালে শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরু শিষ্য পরম্পরা ছিল। শিক্ষার প্রধান মাধ্যম। এই পদ্ধতিতে একজন শীর্ষ গুরুকুলে অর্থাৎ গুরুর বাড়ি বা আশ্রমে বসবাস করে শিক্ষা গ্রহণ করত। মনে করা হতো গরু তার জ্ঞান শিষ্যের থলিতে পূর্ণ করে দেবেন। শিষ্য গুরুর কথা শুনে মুখস্ত করত বেদ, শ্লোক, নীতিকথা। এছাড়াও গণিত, দর্শন, ধনুর্বিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, ব্যবহারিক শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসা ইত্যাদি শেখানো হতো। তখন কোন লিখিত পরীক্ষা ছিল না গুরু যখন সন্তুষ্ট হতেন তখন শিক্ষার সমাপ্তি হত অর্থাৎ প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকই ছিলেন শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু।

শিক্ষা বিস্তারে ইংরেজদের ভূমিকা:

ইংরেজ শাসকরা ভারতে শুধু শাসন করতেই আসেননি। তারা শিক্ষাক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন আনেন। যদিও তাদের মূল লক্ষ্য ছিল নিজেদের শাসন সহজ করা। নিজেদের প্রশাসনিক কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা। কিন্তু নিজেদের প্রয়োজন হলেও ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন আনেন ইংরেজিরা। আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়। প্রথমদিকে মেয়েরা শিক্ষার ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হলেও মেয়েদের জন্য স্কুল কলেজ গড়ে ওঠে এই সময়।

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন কমিশন:

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভারতে বহু শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে যেমন উডের ডেসপ্যাচ (1854) যেখানে নারী শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেয়া হয়েছে। হান্টার কমিশন (1882) যেখানে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার কথা বলা হয়। স্যাডলার কমিশন (1917) এখানে বলা হয় মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষার সাথে সংযোগ স্থাপনের কথা। রাধা কৃষ্ণান কমিশন (1948-49), মুদালিয়র কমিশন (1952-53) কোঠারি কমিশন (1964-66) যেখানে প্রাক প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সর্বস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করার কথা বলা হয়। 10+2+3+2 শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়। এছাড়া তিনটি ভাষার কথা বলা হয় এই কমিশনে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দি এবং বিদেশী ভাষা ইংরেজি। এছাড়াও ১৯৮৬-১৯৯২। নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ যেখানে 10+2+3+২ নীতির পরিবর্তে 5+3+3+4 কাঠামোর কথা বলা হয়। এবং মাতৃভাষায় প্রাথমিকের শিক্ষাদানের কথা বলা হয়। এক কথায় বলা যায় এই কমিশন গুলি ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো গঠন মানোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক শিক্ষার্থী পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি:

প্রথমেই বলি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু শিক্ষার্থী। গতানুগতিক শিক্ষার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে শিক্ষার্থী তার নিজের ইচ্ছা, আগ্রহ অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করবে, শিক্ষক এখানে থাকবে সহায়কের ভূমিকায়। শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দানকারী হিসেবে। শিক্ষক এখানে জ্ঞানদাতা নয় শিখনের যাত্রায় সহযাত্রী। আর বর্তমান পাঠক্রম, পাঠ্যসূচির সবটুকুই তৈরি করা হয়েছে শিক্ষার্থীর রুচি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, মনন সবকিছুকে চিন্তা করে। যেখানে শিক্ষার্থী শিখবে ভিতিহীন হয়ে, তার মানসিক বিকাশের কথাও ভাবা হয়েছে। পাঠ্য পুস্তক গুলিকে সহজ থেকে সহজতর করা হয়েছে যাতে তারা কল্পনার পাখায় ভর করে তাদের কল্পনায় ভেসে যেতে পারে। সমন্বিত পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী খুঁজে পাবে বাস্তব জগতকে।

উপসংহার:

শিক্ষার্থী কল্পনার পাখায় ভর করে কখনো কল্পনার জগতে বিচরণ করবে, আবার কখনো বাস্তবের পথঘাট, বাগানে প্রজাপতির মতো রঙ ছড়িয়ে বিচরণ করবে সর্বত্র। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হয়েছে বন্ধুত্বের। পাঠ্যপুস্তক গুলির পরিপূরক পাঠ্য হিসেবে রয়েছে উইংস, ভাষাপাঠ, জগত বাড়ি। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষাও তৈরি হচ্ছে সুচারুভাবে। বিদ্যালয় এখন ভীতি নয় আনন্দের জায়গা, এক হওয়ার জায়গা। তাই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর ভাবনা, চিন্তা, প্রশ্ন ও মতামতকে গুরুত্ব দেয়ায় শিক্ষকের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

তথ্যসূত্র:

১. প্রাথমিক শিক্ষক শিখনে সমকালীন শিক্ষা ..দেবাশীষ পাল রীতা পাবলিকেশন।

২. প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণে শিক্ষা অধ্যয়ন ..দেবাশীষ পাল রিতা পাবলিকেশন।

৩. বিশেষজ্ঞ কমিটি বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর কমিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

Citation: **Khatun. A.,** (2025) "শিক্ষার বিবর্তন", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-09, September-2025.